অধ্যায় - ৪৯

পরীক্ষা ঃ ১) হরি কনোবা, ২) সোমদেব স্বামী, ৩) নানা সাহেব চাঁদোরকরের কাহিনী

প্রস্তাবনা ঃ-

বেদ ও পুরাণও যেখানে ব্রহ্ম বা সদ্‌গুরুর বর্ণনা করতে নিজেদের অক্ষমতা স্বীকার করে সেখানে আমি এক অল্পজ্ঞ প্রাণী সদ্‌গুরু শ্রী সাইবাবার বর্ণনা কি করে করতে পারি? আমার ব্যক্তিগত মত এই যে এই বিষয়ে মৌন ধারণ করাই উচিত। মূক থাকাই সদ্‌গুরুর বিমল পতাকারূপী লীলা বর্ণনা করার শ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু তাঁর অসাধারণ গুণগুলি আমাদের মূক থাকতে দেয় কোথায়? নানা রকমের সুস্বাদু খাবার যদি বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন একসাথে বসে না খায় তাহলে সে সব তেমন মুখরোচক হয় না। সেই খাবারই সবার সাথে বসে খেলে তাতে একটা বিশেষ স্বাদ পাওয়া যায়। এই সত্যটি 'সাই লীলামৃত'-এর বিষয়েও প্রযোজ্য। এর রসাস্বাদন একান্তে কখনোই হতে পারে না। যদি বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের লোকেরা সবাই মিলে এর রস গ্রহন করে তাহলে আরো বেশী আনন্দ হয়। শ্রী সাইবাবা নিজেই অন্তঃপ্রেরণা দিয়ে তাঁর ইচ্ছানুসারেই তাঁর কথা আমাকে দিয়ে লেখাচ্ছেন। তাই আমাদের শুধু এতটাই কর্তব্য যে অনন্য ভাবে তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁরই ধ্যান করি। তপ-সাধন, তীর্থযাত্রা, ব্রত এবং যজ্ঞ ও দানের চেয়ে হরি-ভক্তি শ্রেষ্ঠ এবং সদ্‌গুরুর ধ্যান এদের সবার মধ্যে পরম শ্রেষ্ঠ। তাই সর্বদা মুখ দিয়ে সাইনাম স্মরণ করে উপদেশগুলির নিদিধাসন এবং তাঁর স্বরূপ চিন্তন করে সমস্ত কর্ম তাঁর জন্যই করা উচিত। ভববন্ধন থেকে মুক্তির এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায় আর কিছু নেই। উপরোক্ত ভাবে যদি আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করি, তাহলে সাইকে বিবশ হয়ে আমাদের সাহায্য করে মুক্তি প্রদান করতেই হবে। এবার এই অধ্যায়ের ঘটনাগুলি শুনুন।

হরি কনোবা ঃ-

বম্বের শ্রী হরি কনোবা নামক এক ভদ্রলোক নিজের বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনদের কাছে শ্রী সাইবাবার অনেক লীলা শুনেছিলেন। কিন্তু ওঁর মনে বিশ্বাস জাগরিত হত না। উনি এক সন্দিগ্ধ প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। উনি স্বয়ং বাবাকে পরীক্ষা করবেন

স্থির করে কয়েকজন বন্ধুর সাথে বম্বে থেকে শিরডী আসেন। ওঁর মাথায় ছিল একটা জরির পাগড়ী ও পায়ে নতুন চটি। দূর থেকে বাবাকে দেখে কাছে গিয়ে বাবাকে প্রণাম করতে চাইছিলেন। কিন্তু ওঁর নতুন চটি এই কাজে বাধক হয়ে দাঁড়াল। কি করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। শেষে নিজের চটির জোড়াটি মন্ডপের এক কোণে রেখে মস্‌জিদে গিয়ে বাবার দর্শন করেন। কিন্তু মনটা চটিতেই পড়েছিল। শ্রদ্ধাপূর্বক বাবাকে প্রণাম করে প্রসাদ এবং উদী নিয়ে উনি ফিরে আসেন। এসে দেখেন যে চটি উধাও। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পেলেন না। শেষে মনঃক্ষুন্ন হয়ে উনি ঘরে ফিরে গেলেন।

স্নান, পূজো ও নৈবেদ্য অর্পন করে খেতে বসলেন। কিন্তু সমস্তটা সময় চটির চিন্তাই মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। খাবার খেয়ে মুখ হাত ধুয়ে উনি বাইরে বেরিয়ে দেখেন একটা মারাঠা ছেলে ওঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। ওর হাতে একটা লাঠির আগায় এক জোড়া চটি ঝুলছিল। বাইরে যারা হাত ধুতে আসছিল তাদের ঐ ছেলেটি বলে- "বাবা আমায় এই লাঠিটা হাতে দিয়ে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে 'হরির বেটা, জরির ফেটা'- বলে ডাক দিতে বলেছেন। তিনি এও বলেছেন- যে বলবে এই চটি তার, তাকে আগে জিজ্ঞাসা করবে যে তার নাম কি হরি এবং ওর পিতার নাম কি 'ক' দিয়ে (অর্থাৎ কনোবা) কি না। তার সাথে-সাথে এও দেখতে যে ওর মাথায় জরির ফেটা (পাগড়ী) আছে কি না। তবেই তাকে চটিটা দিও।" ছেলে টির কথা শুনে হরি কনোবার খুব আনন্দ হয় ও আশ্চর্য্যও লাগে। উনি এগিয়ে গিয়ে বলেন- "এটা আমার চটি। আমারই নাম হরি এবং আমিই 'ক'র (কনোবা) ছেলে। এই আমার জরির পাগড়ী দেখো।" ছেলেটি সন্তুষ্ট হয়ে চটি ওঁকে দিয়ে চলে যায়। উনি ভাবেন- "আমার জরির পাগড়ী তো সবাই দেখেছে। হতে পারে বাবার দৃষ্টিও পড়েছিল। কিন্তু আমি প্রথম বার শিরডী এসেছি তবে বাবা কি করে জানতে পারলেন যে আমারই নাম হরি ও আমার পিতার কনোবা?" উনি তো কেবল বাবাকে পরীক্ষা করতে এসেছিলেন। এই ঘটনার দ্বারা বাবার শ্রেষ্ঠতার পরিচয় পান। ওঁর ইচ্ছে পুরণ হয় এবং উনি সহর্ষে বাড়ী ফিরে আসেন।

সোমদেব স্বামী ঃ-

এবার আরেক অবিশ্বাসী ব্যক্তির কথা শুনুন। তিনিও বাবাকে পরীক্ষা করার জন্য এসেছিলেন। কাকাসাহেব দীক্ষিতের ভাই শ্রী ভাইজী নাগপুরে থাকতেন। ১৯০৬ সালে যখন উনি হিমালয়ে যান তখন হরিদ্বারের কাছে উত্তর কাশীতে ওঁর সোমদেব স্বামীর

(এক সাধু) সঙ্গে পরিচয় হয়। দু'জনে পরস্পরের ঠিকানা লিখে নেন। পাঁচ বছর পর সোমদেব স্বামী নাগপুর আসেন এবং ভাইজীর বাড়ীতে এসে ওঠেন। সেখানে শ্রী সাইবাবার খ্যাতি শুনে ওঁর খুব আনন্দ হয় এবং শিরডী গিয়ে বাবার দর্শন করার তীব্র উৎকণ্ঠা জাগে। মনমাড ও কোপরাগ্রাম পেরিয়ে গেলে উনি একটা টাঙ্গায় চড়ে শিরডী রওনা হন। শিরডী পৌঁছে দূর থেকেই মস্‌জিদের ওপরে দুটি পতাকা উড়তে দেখেন। সাধারণত- দেখা যায় যে বিভিন্ন সন্তদের ব্যবহার, চালচলন এবং তাঁদের জীবনযাত্রা আলাদাই হয়। কিন্তু শুধু তা দিয়েই তাঁদের যোগ্যতা ধার্য্য করাটা ভুল। সোমদেব স্বামী কিন্তু সে কথা বুঝতে পারেন না। পতাকাগুলি উড়তে দেখে উনি ভাবেন- "সন্ত হয়ে বাবার এই পতাকার প্রতি এত অনুরাগ কেন? এতে কি তার সন্তচরিত্র প্রকাশ পায়? আমার তো মনে হয় বাবার নিজের খ্যাতির প্রতি খুব টান।" অতএব উনি শিরডীতে বাবার দর্শন করার ইচ্ছে ত্যাগ করে নিজের সহযাত্রীদের বলেন- "আমি ফিরে যেতে চাই।" তখন ওরা বলে- "তাহলে এত দূর মিছিমিছি এলে? শুধু দুটো পতাকা দেখেই তুমি এত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছ। যখন রথ, পাল্কি, ঘোড়া এবং অন্যান্য সামগ্রী দেখবে, তখন তোমার কি দশা হবে?" স্বামী এতে আরো ঘাবড়ে যান এবং বলেন- "আমি অনেক সাধু-সন্তের দর্শন করেছি। কিন্তু এই মহাপুরুষ তো বিলক্ষণ, যিনি এইরূপ ঐশ্বর্য্যের সামগ্রী সংগ্রহ করেন। এই ধরনের সাধুর দর্শন না করাই ভালো।" এই বলে উনি ফিরে যেতে উদ্যত হন। কিন্তু অন্যান্য সহযাত্রীরা ওঁকে প্রতিরোধ করে এরকম সংকুচিত মনোবৃত্তি ছাড়তে বলে। তারা জানায়- "মস্‌জিদে যে সাধু থাকেন তিনি এই পতাকা বা অন্য সামগ্রী বা নিজের খ্যাতির কথা স্বপ্নেও ভাবেন না। এ সব তাঁর ভক্তরা শ্রদ্ধা, ভক্তি ভালোবাসায় তাঁকে অর্পণ করেছে।" শেষে উনি বাবার দর্শন করতে রাজী হন। মস্‌জিদের মন্ডপে পৌঁছে উনি স্তব্ধ হয়ে যান। উনার চোখ জলে ভরে আসে ও কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। এবার ওঁর সব দূষিত ধারণা মন থেকে দূর হয়ে নিজের গুরুর উপদেশ মনে পড়ে- "মন যেখানে অতি প্রসন্ন ও মুগ্ধ হয়, সেই স্থানটিকেই নিজের বিশ্রামধাম মনে কোর।" উনি বাবার চরণে লুটিয়ে পড়তে চাইছিলেন কিন্তু বাবার কাছে যেতেই বাবা সহসা রেগে ওঠেন এবং চেঁচিয়ে বলেন- "আমার জিনিষ-পত্তর আমার কাছেই থাকতে দাও। তুমি নিজের বাড়ী ফিরে যাও। সাবধান! আর কখনো এই মস্‌জিদের সিঁড়ি চড়ো না। এমন সন্তের দর্শন করার কি দরকার, যে মস্‌জিদের উপর পতাকা ওড়ায়। এটা কি সন্ত হওয়ার লক্ষণ? এক দন্ডও এখানে থেকো না।" এবার স্বামী বুঝতে পারেন যে বাবা ওঁর মনের সমস্ত কথা জানেন এবং তিনি কত সর্বজ্ঞ। নিজের জ্ঞানের কথা ভেবে ওঁর হাসি

পায় এবং উনি অনুভব করেন যে, বাবা কত নির্বিকার ও পবিত্র। উনি দেখেন যে বাবা কাউকে বুকে জড়িয়ে ধরছেন, কাউকে স্পর্শ করছেন, আবার কাউকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখছেন। সব ভক্তদেরই 'উদী' প্রসাদ দিয়ে সব রকম ভাবে সন্তোষ প্রদান করছেন। এই সব দেখে ওঁর মনে হয়- "আমার সাথেই এমন কঠিন ব্যবহার কেন?" গভীর ভাবে চিন্তা করার পর বুঝতে পারেন- "এর আসল কারণ আমার অন্তরের বিচারধারা। এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমায় নিজেকে বদলানো উচিত। বাবার রাগও আমার জন্য আশীর্বাদস্বরূপ।" বলাবাহুল্য, উনি তারপর বাবার শরণে গিয়ে তাঁর পরম ভক্ত হয়ে ওঠেন।

নানা সাহেব চাঁদোরকর ঃ-

এবার নানাসাহেব চাঁদোরকরের কথা লিখে হেমাডপন্ত এই অধ্যায়টি শেষ করছেন। একবার বাবা নানাসাহেব মহালসাপতি এবং অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে মস্‌জিদে বসেছিলেন। সেই সময় বীজাপুর থেকে এক মুসলমান ভদ্রলোক সপরিবারে শ্রী সাইবাবার দর্শন করতে আসেন। বোরখা পরা মহিলাদের লাজুক ভাব দেখে নানাসাহেব সেখান থেকে চলে যেতে চাইলেন। কিন্তু বাবা ওঁকে সেখানেই বসে থাকতে বলেন।। মহিলা দুটি এগিয়ে গিয়ে বাবাকে দর্শন করেন। ওঁদের মধ্যে একজন নিজের মাথার ঘোমটাটি সরিয়ে বাবার চরণে প্রণাম করে আবার ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে নেন। নানাসাহেব মহিলাটির অপরুপ ও বিরল সৌন্দর্য্যর প্রতি আকর্ষিত হয়ে আরেক বার সেই রূপ দেখার জন্য লালায়িত হয়ে ওঠেন। মহিলাটি চলে যাওয়ার পর নানার মনের অবস্থা জেনে, বাবা ওঁকে বলেন- "নানা, মিছিমিছি কেন মোহিত হচ্ছ? ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজেদের কাজ করতে দাও। আমাদের তাতে বাধা দেওয়া উচিত নয়। ভগবান এই সুন্দর জগত নির্মাণ করেছেন। অতএব আমাদের কর্তব্য তার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করা। এই মন তো ধীরে-ধীরেই স্থির হয় এবং যখন সামনের দরজা খোলা আছে, তখন পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করার কি দরকার? চিত্ত শুদ্ধ হতেই কোন কষ্ট অনুভব হয় না। যদি আমাদের মনে কোন কুবিচার না থাকে, তাহলে কারো কাছে ভয় পাওয়ার কি দরকার? চোখ দুটিকে নিজের কাজ করতে দাও। তার জন্য তোমার লজ্জিত বা বিচলিত হওয়া উচিত নয়।" সে সময় শামাও সেখানেই ছিলেন। উনি বাবার কথার তাৎপর্য্য বুঝতে পারেন না। তাই মস্‌জিদ থেকে ফেরার পথে নানাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ঐ পরম সুন্দরীর রূপ দেখে উনি যে রূপ মোহিত হয়েছিলেন এবং সেই মনোকষ্ট জেনে বাবা ওঁকে যা উপদেশ দেন তার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত নানাসাহেব শামাকে

এইরূপ বোঝান -

"আমাদের মন স্বভাবতই চঞ্চল, কিন্তু আমাদের তাকে লম্পট হতে দেওয়া উচিত নয়। ইন্দ্রিয়গুলি তো সব সময় নিজেদের বিষয় পদার্থের প্রতি ধাওয়া করে। কিন্তু তাদের পেছনে আমরা যেন ধাওয়া না করি। এই ভাবে অভ্যাস করলে চঞ্চলতা জয় করা যেতে পারে। যদিও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ (ইন্দ্রিয়গুলি দমন করা) সম্ভব নয় তবুও তাদের বশীভূত হওয়া উচিত নয়। প্রয়োজান অনুসারে আমাদের ঠিক ঠিক ভাবে সেগুলির গতি অবরোধ করা উচিত। সৌন্দর্য্য তো দেখার জিনিষ, তাই নির্ভয়ে সুন্দর জিনিষগুলি দেখা উচিত। যদি মনে কোন কুবিচার না থাকে তাহলে লজ্জা বা ভয়ের প্রয়োজনই বা কি? ইচ্ছাশূন্য মন নিয়ে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলেও ইন্দ্রিয়গুলি সহজ ও স্বাভাবিক রূপে আমাদের বশে এসে যাবে। তখন বিষয়ানন্দ উপভোগ করার সময়ও তোমার ঈশ্বরের কথাই মনে পড়বে। যদি মনকে বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলি পেছনে ছেড়ে ও সেগুলিতে লিপ্ত থাকতে দাও, তাহলে জন্ম-মৃত্যুর পাশ থেকে কখনো মুক্তি পাবে না। বিষয় পদার্থ ইন্দ্রিয়গুলিকে সব সময় পথভ্রষ্ট করে। অতএব আমাদের উচিত বিবেককে সারথি করে মনের লাগাম নিজের হাতে নিয়ে ইন্দ্রিয়রূপী ঘোড়াকে কাম্য বস্তুর দিকে না যেতে দেওয়া। এই ভাবে বিবেকরূপী সারথির সাহায্যে আমরা বিষ্ণু-পদ প্রাপ্ত করতে পারব। সেটি হল আমাদের আসল পরম সত্যধাম, এবং সেখানে গিয়ে প্রাণী আর কখনো এখানে ফিরে আসে না।"

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।